এই শহরে এই বন্দরে

কাইউম পারভেজ

।। সাতাশ ।।

কি ব্যাপার অর্পন এই উইক্‌ডে-তে তলব করলে কেন?
আমি না দেওয়ান । তলব করেছে আমার বউ ।
বলতো বর্ণা, কি তোমার বাসনা?
তার আগে বর্ণা আমাকে বলো তোমার রসনার খবর । খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে ।
শোন হিমাদ্রী । রান্না তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না । বলতে পারো গতানুগতিক মেনু আর তার সঙ্গে কেক ।
কেক কেন? আজ যে তোমাদের দুজনার কারো জন্মদিন নয় তা আমি ঢের জানি । তোমাদের বিবাহ বার্ষিকীও নয় । তাহলে কেক কেন?
আজ এগারোই জ্যৈষ্ঠ । অর্পনের প্রিয় কবি-র জন্মদিন । তাই তোমাদেরকে ডেকেছি আজকেই আমরা ঘরোয়াভাবে কবি-র জন্মদিনটা পালন করবো । উইকএন্ডে করলে দিনটা বাসি হয়ে যাবে ।

মিটিলো না সাধ ভালো বাসিয়া তোমায়
বাসিতে ভালো পূনঃ আসিবো ধরায় ।

কি হোল দেওয়ান ভাই । টু হুম ইট মে কনসার্ন? কার উদ্দেশ্যে এ গান । কার জন্যে আবার ধরায় ফিরে আসতে চান?
বর্ণা, নিশ্চয়ই দেখো, ও গান আমার জন্যে নয়?
শোন হিমাদ্রী - এদের আত্মা খুব ছোট । মনে মনে বউকে ভালোবাসবে সেটাও স্বীকার করবে না পাছে ওদের পৌরষে লাগে ।
হিমাদ্রী তুমি বরং ওকে শুনিয়ে দাও ----

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই কেন মনে রাখো তারে
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একবারে ।

না অর্পন ভাই । হাজার বললেও উনি গাইবেন ---

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে
রহিলো আঁকা

নইলে গাইবেন ---

ভুলিতে পারিনে তাই আসিয়াছি পথ ভুলি
ভোলো মোর সে অপরাধ, আজ যে লগ্ন গোধূলী ।

এ্যাই হিমাদ্রী । দেওয়ান ভাইয়ের গলাটা কিন্তু খারাপ না ।
হ্যাঁ - নজরুল গীতি ওর গলায় ভালোই লাগে । ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় ও একটাই নজরুল গীতি জানতো ।
কোনটা হিমাদ্রী?
আমার পেছনে যখন ঘুরঘুর করতো তখন আমাকে দেখলেই গাইতো

আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন
দিল ওহি মেরা ফাঁস গেয়ি
বিনোদ বেণীর জরির ফিতায়
আন্ধা ইস্‌ক মেরা কস্‌ গেয়ি ।

শোন বর্না - সে জন্যেই উনি, অর্থাৎ হিমাদ্রী হক, তখন প্রতিদিন সুন্দর করে একটা খোঁপা বেঁধে ক্যাম্পাসে আসতেন ।
ইস্‌ আমি হলে তখন গাইতাম -

মোর প্রিয়া হবে এসো রানী
দেবো খোঁপায় তারার ফুল
কর্নে দোলাবো তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দুল ।

অর্পণ ভাই, ভাগ্যিস আপনি হননি, নইলে আপনার বন্ধু তো বিধবা হয়ে যেত ।
হলে আর কিইবা করতাম । মনের দুঃখে হয়তো গাইতাম - জনম জনম গেলো আশা পথ চাহি । অথবা আবৃতি করতাম

যেদিন আমি হারিয়ে যাবো বুঝবে সেদিন বুঝবে
অস্তপারের সন্ধ্যা তারায় আমার খবর পুঁছবে ।

ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি
সাগর আকাশ বাতাস চিরি

যেদিন আমায় খুঁজবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে ।

এই - তোমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছো - এই যে এতক্ষন ধরে আমরা সাবলীল কথা বলে যাচ্ছি এর প্রতিটি মুহূর্তে আমার প্রিয় কবি-র গান আর কবিতা গুলো অনায়াসে এসে যাচ্ছে । এভাবে আমরা যদি আরো কিছুক্ষণ কথা বলি দেখবে আমাদের দুখু মিয়া কিভাবে আমাদের প্রাণের মধ্যে মিশে আছে ।
সত্যি অর্পন - ভেবে দ্যাখো এই ক্ষ্যাপা তাঁর ৭৭ বছর জীবনকালের মধ্যে সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র তেইশ বছর (১৯১৯-১৯৪২) । বলতে গেলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝের সময়টাতেই মূলতঃ তিনি লিখেছেন । এই তেইশ বছরে বিদ্রোহী কবি লিখেছেন ২২টি কবিতা গ্রন্থ, ৩টি উপন্যাস, ৩টি গল্পগ্রন্থ, ৩টি নাটক, ৩টি কাব্যানুবাদ, ২টি কিশোর কাব্য, ২টি কিশোর নাটিকা, ৫টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৪টি সঙ্গীত গ্রন্থ । তাঁর রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে সকলের অনুমান হাজার চার পাঁচ হবে । এক অদ্ভূত জীবন তাঁর । ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯৯ সালের ২৪ মে, মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মে ছিলেন দুখু মিয়া - কেউ ডাকতেন "তারা ক্ষ্যাপা" । বাবা কাজী ফকির আহমেদ আর মা জাহেদা খাতুন সখ করে নাম রাখলেন কাজী নজরুল ইসলাম যাকে প্রিয়বন্ধু কবি জসীমউদ্দীন বর্ননা করেছেন এভাবে - কাজী নজরুল ইসলাম/বাসায় একদিন গেছিলাম/ভায়া লাফ দেয় তিন হাত/হেসে গান গায় দিন রাত ।
দেওয়ান - কবি তো নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে - "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণ তূর্য" । একদিকে দ্রোহ ঘোষনা অন্যদিকে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা শান্তির আবাহনী । বলো দেওয়ান তুমি যা বলছিলে -
তো, সেই দুখু মিয়া পিতৃহারা হলেন ১৯০৮-এ । ১৯১০-এ গ্রামের মক্তব থেকে নিু প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করলেন । একই সময়ে সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে মাজার শরীফের খাদেম, মক্তবের ছাত্র পড়ানো এবং সেই সঙ্গে মসজিদের ইমামতিও । পেটতো চলে না । তাই রানীগঞ্জে বাবুর্চিগিরি - আসানসোলে রুটির দোকানে চাকরী । দারিদ্র পীড়িত অভাবের মধ্যেও হাতের প্রিয় বাঁশীটি তাঁর নিত্য সঙ্গী । ইতিমধ্যে বর্ধমানে হাইস্কুলেও যাতায়াত চলছে । তো, সেই রুটির দোকানেই ময়মনসিংহের পুলিশ ইন্সপেকটার কাজী রফিজউল্লাহর সাথে পরিচয় এবং "ক্ষ্যাপা" চলে গেলেন তাঁর সাথে ময়মনসিংহের দরিরামপুর - আজ যেটা কাজীর সিমলা । দরিরামপুর হাইস্কুলে ক্লাস সেভেন পর্য্যন্ত পড়ে আবার ভাগোয়াট সেই রানীগঞ্জে । ১৯১৫ সালে শিয়ারসোল হাইস্কুলে আবার ভর্ত্তি হলেন । এবার এইটে । ১৯১৭তে যখন ক্লাস টেনের ছাত্র তখনই নাম লেখালেন ৪৯ বাঙ্গালী পল্টনে । নৌশেরা-র ট্রেনিং শেষে তারপর করাচি । করাচিতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর লেখা গল্প "বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী" কলকাতার মাসিক সওগাত পত্রিকায় হাবিলদার নজরুল ইসলাম নামে ছাপা হয় এবং দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করে ।
আচ্ছা দেওয়ান ভাই - তাহলে বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী কি নজরুলের প্রথম রচনা?

বর্ণা, কবি নজরুলের প্রথম রচনা নিয়ে ভিন্নমত আছে। তবে এটাই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা। তোমরা নিশ্চয়ই জানো কবি-র সবচে' প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ দুজন বন্ধু ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে নজরুলের প্রথম কবিতার নাম "রাজার গড়" যেটা কবি লিখেছিলেন ১২ বছর বয়েসে। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। সেটা হোল কবির চাচা বজলে করিম, নিশা গ্রামের লেটোর দলের পরিচালক ছিলেন। এই চাচা আর মক্তবের শিক্ষক ফজলে আহমদের কাছ থেকে কবি নিয়েছিলেন আরবী ফার্সীর হাতেখড়ি। চাচার সাথে প্রায়ই চলে যেতেন লেটোর দলে।

এ্যাই দেওয়ান ভাই লেটো গান কি?

বর্ণা - লেটো হোল যাত্রা আর কবিগানের মিশ্রনে তৈরী এক ধরনের গান। দুটি দলের মধ্যে নাচ গান আর অভিনয়ের মধ্যদিয়ে প্রশ্ন উত্তরের প্রতিযোগিতামূলক পালাগানের অনুষ্ঠান। চাচার মৃত্যুর পর বারো বছর বয়সেই নজরুল লেটোর দলের হাল ধরলেন। সাহিত্য ইতিহাস পূরাণ আরবী ফার্সি সব মিলিয়ে তৈরী করতে লাগলেন লেটোর গান। সেই কিশোর নজরুলের উল্লেখযোগ্য এবং বিখ্যাত কয়েকটি লেটোর পালা হোল - শকুনি বধ, মেঘনাদ বধ, চাষার সঙ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, যুধিষ্টির, দাতাকর্ণ, আকবর বাদশা ইত্যাদি।

তাহলে তো দেওয়ান বলতে হয় নজরুলের প্রাথমিক রচনাবলী এইসব লেটোর পালা সমূহ।

হ্যাঁ তা বলা যায় বৈকি।

করাচিতে থাকাকালীন সময়ে নজরুল বেশ কয়েকটি ছোট গল্প রচনা করেছিলেন। যেমন- রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহেরনেগার, সাঁঝের তারা, রাক্ষুসী ইত্যাদি। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে কবি দেশে ফিরলেন। মার্চে বাঙালী পল্টন ভেঙ্গে দেয়া হলে নজরুল প্রথমে প্রিয় বন্ধু শৈলজানন্দের মেসে এবং পরবর্তীতে কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের সাথে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস কক্ষে একত্রে বসবাস শুরু করলেন। তখনই লিখলেন তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতা "মুক্তি" যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। কবি এ কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন "ক্ষমা" পরে মুজাফ্ফর সাহেবই এর নাম পরিবর্তন করে ছেপেছিলেন "মুক্তি" নামে। এরপরই শুরু হোল তাঁর তুখোড় লেখালিখি। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ "তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা" প্রকাশিত হয় সওগাত পত্রিকায়। ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে "বিদ্রোহী" কবিতা প্রকাশের সাথে সাথে নজরুলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। এ বিদ্রোহী কবিতা কবি লিখেছিলেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন থাকতেন প্রিয়বন্ধু কমরেড মুজাফ্ফরের সঙ্গে। মুজাফ্ফর আহমেদ "কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা" গ্রন্থে লিখেছেন - "আমাদের ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাড়িটি ছিলো চারখানা ঘরের একটি পুরো দোতালা বাড়ী। --- তখন নজরুল আর আমি নীচের তলায় পূর্ব দিকের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তার "বিদ্রোহী" কবিতাটি লিখেছিলো। সে কবিতাটি লিখেছিলো রাত্রিতে। রাত্রির কোন সময়ে তা আমি জানিনে। রাত দশটার পর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি

বসেছি এমন সময়ে নজরুল বললো সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে আমায় পড়ে শোনালো। "বিদ্রোহী কবিতার আমি-ই প্রথম শ্রোতা।"

দেওয়ান তুমিতো ভালোই মনে রেখেছো। আচ্ছা "ব্যাথার দান" তো বুঝি কবির প্রথম গল্পগ্রন্থ তাই না?
হ্যাঁ অর্পন - তাই। এবং ওটাই কবি-র প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ হোল "অগ্নি-বীণা"। যে সব পত্রিকায় নজরুলের লেখা ছাপা হোত সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল - বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য, সওগাত, মোসলেম ভারত, নওরোজ, নারায়ণ, বিজলী প্রভৃতি। "বিদ্রোহী" প্রথম ছাপা হয়েছিলো বিজলীতে।
দেওয়ান তুমি বোধ হয় জানো কিছু কিছু পত্রিকা এবং ব্যক্তি নজরুল প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে নিয়ে বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেছে। এদের মধ্যে আছে প্রবাসী, সাপ্তাহিক মোহম্মদী, শনিবারের চিঠি ইত্যাদি। দুজন ব্যক্তি যাদের সীমাহীন হীনমন্যতা শুধু নজরুলকেই নয় গোটা বাঙালী সমাজকে নাড়া দিয়েছে তারা হোল মোহিতলাল মজুমদার এবং সজনীকান্ত দাস। মোহিতলার মজুমদার তো বলেই বসলেন বিদ্রোহী কবিতা তাঁর "আমি" প্রবন্ধকে অনূকরণ করে লেখা হয়েছে। আর সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি-তে বিদ্রোহী কবিতা-কে ব্যঙ্গ করে "ব্যাঙ" শিরোনামে একটি কবিতা লিখলেন। তোমরা লক্ষ্য কর নজরুল তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় যেখানে বলছেন ----

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার।

সেখানে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন ---

আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।
আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিত ফণা
আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গণা
আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি
আমি "বে অব বিস্কে" সাইক্লোন, আমি মরু সাহারা আঁধি।

অর্পন - মোহিতলাল মজুমদার এবং সজনীকান্ত দাসেরা সর্বকালের। ওরা তখনো ছিলো এখনো আছে। এই দাস-মজুমদাররা দেশেও আছে, প্রবাসেও আছে। তবে ওদের চেহারা সাধারণ মানুষের কাছে খুবই স্পষ্ট। আলোতে থাক্ আর আঁধারেই থাক্। শনিবারের চিঠি-তে মোট ৩৫টি সংখ্যায় ওরা নজরুলকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা, নিবন্ধ,

প্যারোডি, নাটিকা লিখেছে স্বনামে-বেনামে । পেরেছে কি ওরা নজরুল প্রতিভাকে দমিয়ে রাখতে? পারেনি । নজরুলের ভাষাতেই বলি - সত্য চির সুন্দর । সত্যের জয় হবেই । আজ অথবা কাল । শোন বর্ণা - "ব্যাঙ" দেখে নজরুল কিন্তু দমে যাননি । এর যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন কল্লোলে প্রকাশিত তাঁর "সর্বনাশের ঘন্টা" কবিতায় । শুনবে তার কটি লাইন?
বল না অর্পন ---

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা ।

চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজ তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি!

কোথা সে দীঘির উচ্ছল জল কোথা সে কমল রাঙা
হেরি শুধু কাদা শুকায়েছ জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা!
সেই কাদা মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং
বাঁদর নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং ।

ওদিকে কবিগুরু কিন্তু নজরুলকে সব সময়েই তাঁর লেখার জন্য উৎসাহ দিয়ে এসেছেন । নজরুল যখন "ধূমকেতু" নামে অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলেন কবিগুরু তাঁকে আশীর্বাদ করে লিখলেন

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন ।

দেওয়ান ভাই - বিশ্বকবি তাঁর "বসন্ত" গীতিনাট্যখানিও তো নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন তাই না?
হ্যাঁ বর্ণা তাই । তেমনি নজরুল তাঁর গোটা সঞ্চিতাটাই উৎসর্গ করেছেন কবিগুরু কে ।

হিমাদ্রী তুমি যেন অনেকক্ষণ থেকে হাত উঁচিয়ে আছো কিছু বলার জন্য
জ্বি আজ্ঞে, যদি তোমরা দয়া করে একটু সুযোগ দাও দেওয়ান ।
বেশ বল ।

আমার জানা মতে এই ধূমকেতুতেই কবি ১৯২২ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর পূজা সংখ্যায় লিখলেন "আনন্দময়ীর আগমনে" সম্পাদকীয় কবিতাখানি, যার জন্য ইংরেজ সরকার পরবর্তীতে কবি-কে এই কবিতার কারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করলো কুমিল্লার কান্দির পাড় থেকে ২৩ শে নভেম্বর। ১৬ জানুয়ারী ১৯২৩ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মি. সুইন হো-র আদালতে কবিকে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হোল।
এই হিমাদ্রী - আনন্দময়ীর আগমনে কবিতাটা যেন কোনটা?
ওই যে -
আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা - আসবি কখন সর্বনাশী?

এবার দেখছি বর্নাও হাত তুলে আছে। বল বর্ণা -
আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম, তার আগে জিজ্ঞেস করছি - তোমরা খাবে না?
হ্যাঁ খেতে তো হবে। আমাদের আলাপ এখুনি শেষ করবো। বল তুমি কি বলবে?
কবি এক সময়ে স্থির করলেন তিনি পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ করবেন এবং তা কবিতার ছন্দে। অসুস্থতার কারণে শেষ করতে পারেননি। তার কিছু অংশ "কাব্যে আমপারা" তে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে।
বর্ণা - নজরুল যেমনি অসংখ্য ইসলামী গান গজল কাওয়ালী লিখেছেন তেমনি লিখেছেন শ্যামা সঙ্গীত।
হ্যাঁ মানুষটা এতো তাড়াতাড়ি থমকে যাবে কেউ ভাবতে পারেনি। ১৯৪২ সালে কবি অসুস্থ হন। স্থানীয়ভাবে লুম্বিনী পার্ক, রাঁচী মানসিক হাসপাতালে ব্যর্থ চিকিৎসার পর তাঁকে ১৯৫৩ সালে ইংল্যান্ডে এবং পরে জার্মানীতে নেয়া হয়। কোন ফল পাওয়া যায় নি। সেই যে কবি নীরব হলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৩৪টি বছর নীরব থেকে গেলেন। নিজের প্রশ্ন নিজেই তৈরী করে রেখেছিলেন অনেক আগে থেকে - "ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি"। এই নীরব কবিকে জাতীয় কবি ঘোষনা করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৪ মে ঢাকায় নিয়ে এলেন। সেই থেকেই ঢাকায়। অবশেষে ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩, ইংরেজী ২৯ আগষ্ট রোববার, ১৯৭৬-এ কবি পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।
কি আশ্চর্য দেখেছো - বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন ঠিক তার আগের বছর পঁচাত্তরের আগষ্টে আর কবি চলে গেলেন ছিয়াত্তরের আগষ্টে।
দেওয়ান - কবি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন তিনি আর কথা বলতে পারবেন না। নইলে দেখো তাঁর বাকশক্তি হারিয়ে গেলো ১৯৪২-এ। ১৯৪১-এ ৫ ও ৬ এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবলি উৎসব অনুষ্ঠানে কবি সভাপতি হিসেবে যে দীর্ঘ ভাষন দেন সেটাই সম্ভবত তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। সেই ভাষনের মধ্যেই তিনি বলেছিলেন - " যদি আর বাঁশি না বাজে - আমি কবি বলে বলছিনে - আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি - আমায়

ক্ষমা করবেন - আমায় ভুলে যাবেন । বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি - আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম - সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নিরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম । ------ মনে করবেন পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিলো, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেলো । -----

কি হোল তোমরা আর কতক্ষণ এমন চুপ করে থাকবে? খাবে না, কেক কাটবে না?
না হিমাদ্রী । কেকটা না হয় থাক । মোমবাতি গুলো জ্বলছে জ্বলুক । বর্ণা - তুমি ঘরের লাইটগুলো সব নিভিয়ে দাও । প্লেয়ারে আমার প্রিয় কবি-র সেই গানটা বাজাও । গান শুনে না হয় খেতে যাবো ।
দিচ্ছি অর্পন ।

আমি চিরতরে দুরে চলে যাবো
তবু আমারে দেব না ভুলিতে

--- দেখিবে কে যেন মরে পড়ে আছে
তোমার পথের ধূলিতে
তবু আমারে দেব না ভুলিতে ।

(চলবে)